BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 12(17 & 18), 2016: 99-125
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

নারী নেতৃত্বের স্বরূপঃ পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম

মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী* ও শামীমা নাসরিন**

সারসংক্ষেপঃ ইসলামি জীবনবিধান নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। কুরআন সুন্নাহে নারী নেতৃত্ব বৈধ বা অবৈধ হওয়া বিষয়ে সরাসরি বা স্পষ্ট নির্দেশ নেই। তবে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে তারা অংশ নিবে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মহানবি সা. কোনো নারীকে কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ দেননি। তবে পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব সম্পর্কিত একটি আয়াত ও পারস্য সাম্রাজ্যে এক নারীর সাম্রাজ্ঞী হওয়ার প্রেক্ষাপটে মহানবি সা.-এর এক মন্তব্য সম্বলিত একটি বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে আলিমগণ প্রচুর মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ আলিম এ হাদিসের উদ্ধৃতিতে নারী নেতৃত্ব অবৈধ বলেছেন। অনেকে হাদিসটি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। কেউ কেউ হাদিসটির ভাষ্য বর্ণনামূলক, বিধানমূলক নয় বলেছেন। অনেকে নেতৃত্বের ধরনের বিভাজন টেনে রাষ্ট্রপ্রধান ব্যতীত অন্যান্য পদে নারীর নেতৃত্ব বৈধ বলেছেন। কেউ কেউ এর সাথে ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও মূল্যবোধের আলোকে কিছু শর্তারোপ করে একে বৈধ বলেছেন। সুতরাং মানবসমাজের অংশ হিসেবে নারীরা এ সমাজে কোন ধরনের নেতৃত্ব দিতে পারবে, আবার কোন ধরনের পারবে না- তা যাচাই বাছাই করে এ বিষয়ে ইসলাম ও মুসলিম আলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল শব্দসমূহঃ নারী নেতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন, মুসলিম, ইসলাম এবং জীবনবিধান।

ভূমিকা

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক জীব। সমাজে সাধারণত অর্ধেক নারী। তাদেরকে বিচ্ছিন্ন রেখে সমাজ উন্নয়ন সম্ভব নয়। জীবনবিধান হিসেবে সমাজে নারী নেতৃত্বের বিষয়ে বা কোন নেতৃত্ব সম্পর্কে ইসলাম কি বলে, তা নিয়ে অতীতে কিছু কিছু মতভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকলেও বিশেষত আধুনিককালে বিশাল বিতর্ক বিরাজমান। ইসলাম বিদ্বেষী মহল দাবি করছে, ইসলাম নারীর অধিকার হরণ ও প্রতিভার অবমূল্যায়ন করেছে, তাদের সমঅধিকার দেয়া হয়নি। যেমনঃ তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়া হয়নি। কয়েকটি মুসলিম দেশে সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান নারী হওয়ায় এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক চলছে। বাংলাদেশেও কিছু কিছু আলিম যারা একদিন কুরআন সুন্নাহ বিরোধী বলে নারী নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছেন, ১৯৯১ সনে জাতীয় নির্বাচনের পর তাদের অনেকে প্রয়োজনে নারী নেতৃত্ব বৈধ বলে মেনে নিয়েছেন।[১]

* ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, প্রফেসর, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, E-mail: anwariiu@yahoo.com

** শামীমা নাসরীন, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজ, নান্দাইল, ময়মনসিংহ, E-mail: shamiman1973@gmail.com

এছাড়া, নারীরা সালাতে ইমামতি করতে পারবে কিনা বর্তমানে এ নিয়েও বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এখানেও নারী নেতৃত্বের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। বিশেষত ২০০৫ সনের মার্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউয়র্কে ড. আমিনা ওয়াদুদ নামে একজন মহিলা নারী পুরুষের সম্মিলনে জুমআহর সালাতে ইমামতির ঘোষণা দেয়ায় এ বিতর্ক আরো জোরালো হয়েছে।[২] এসব দিকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ পর্যালোচনা করে একটি দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্টাই বর্তমান গবেষণার অবতারণা।

নেতৃত্বের স্বরূপ

সাধারণত যেকোনো লক্ষ্য অর্জনে সংঘবদ্ধ কার্যাবলী পরিচালনায় কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সংঘবদ্ধ সদস্যদের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী আচরণকে নেতৃত্ব বলা হয়। নেতৃত্ব শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ: নেতার পদ, পরিচালকের পদ।[৩] ইংরেজিতে-এর প্রতিশব্দ Leadership- অর্থ- The state or position of being a leader, power of leading.[৪] আরবিতে একই অর্থে কিয়াদাহ (قيادة) প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। যদিও মুসলিম সমাজে আরো কিছু পরিভাষা প্রচলিত। যেমন: ইমামত, রিয়াসাহ (رياسة), ইমারাহ (إمارة), সিয়াদাহ (سيادة) ইত্যাদি। ইমামত (إمامة) শব্দটি আলিমগণ কোনো মাযহাবের বা বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ বুঝাতেও ব্যবহার করেন। যেমন: ইমাম আলি রা., ইমাম আবু হানিফা রহ.। খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হতো।

সমাজ-মনোবিজ্ঞানী ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞগণ নেতৃত্বের ইংরেজি Leadership শব্দটির পারিভাষিক অর্থ বা স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রচুর মন্তব্য করেছেন। যার মমার্থ প্রায় কাছাকাছি। তন্মধ্যে ক'টি নিম্নরূপ:

- বার্নার্ড কিস ও টমাস কেইস-এর মতে, "নেতৃত্ব হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যা অন্যদেরকে কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্য সম্পাদনে প্ররোচনা ও সমর্থন যুগিয়ে থাকে" (Leadership is the process of influencing and supporting others to work enthusiastically toward achieving objectives.)[৫]
- বার্নাডের (Barnard) মতে, নেতৃত্ব বলতে "ব্যক্তিবর্গে আচরণের সেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণকে বুঝায়, যার মাধ্যমে তারা মানুষের কার্যাবলীকে সংগঠিত রূপে পরিচালনা করেন" (Leadership refers to the quality of the behaviour of individuals whereby they guide people of their activities in organized effort.)[৬]
- ট্যানেনবাম-এর মতানুসারে, "নেতৃত্ব হলো একটি আন্তঃব্যক্তিক প্রভাব যা অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুশীলন করা হয় এবং যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় নির্দেশিত হয়" (Leadership is the interpersonal influence exercised in a situation and directed through the communication process towards the attainment of specific goals.)[৭]

সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনায় বলা যায়, নেতৃত্ব হলো একটি কলাকৌশল ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণগত বিশেষণের নাম, যার মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনায় ও যোগাযোগে নির্দিষ্ট একটি সামষ্টিক

লক্ষ্য অর্জনে অধীনস্তদের সংগঠিত, প্রভাবিত ও উৎসাহিত করে এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা নিয়ে কর্মতৎরতা পরিচালনা করা হয়।

নারী নেতৃত্ব নিয়ে মতবিরোধ ও সিদ্ধান্ত

উল্লেখ্য, কুরআন সুন্নাহে নারী নেতৃত্ব বৈধ বা অবৈধ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ নেই। রসুল সা.-এর যুগে কোনো নারীকে গভর্নর, বিভিন্ন অভিযানে দলনেতা বা বিচারিক নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন বলে প্রমাণিত নয়। খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও তাই। এজন্য পরবর্তী আলিমগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ করেছেন। তাদের মতামতসমূহ প্রধানত ছয় ধরনের:

প্রথম অভিমত : সকল ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব অবৈধ, কারো মতে হারাম।

দ্বিতীয় অভিমত : সকল ক্ষেত্রে সব ধরনের নারী নেতৃত্ব বৈধ।

তৃতীয় অভিমত : মজলিশে শুরা ব্যবস্থায় বা যৌথ নেতৃত্বে নারীর সর্বোচ্চ নেতৃত্বসহ সকল ক্ষেত্রের নেতৃত্ব বৈধ।

চতুর্থ অভিমত : বিশেষ অবস্থা বা প্রেক্ষাপটে নারীর রাষ্ট্রপ্রধানসহ সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বৈধ।

পঞ্চম অভিমত : বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব বৈধ।

ষষ্ঠ অভিমত : গোটা জাতির উপর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ব্যতীত অন্যান্য সব ধরনের নারী নেতৃত্ব বৈধ। নিম্নে এসব পর্যালোচনা করা হলো:

প্রথম অভিমত: সকল ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব অবৈধ বরং হারাম (অধিকাংশ আলিম)

অধিকাংশ আলিমের মতে সকল ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব জায়েয নয় তথা বৈধ নয়। কারো কারো মতে এটা হারাম তথা তাদেরকে নেতা নিয়োগ করা হালাল নয়।[৮] এসব মতের সমর্থনকারীগণ কয়েক ধরনের দলিল উপস্থাপন করেন। সেগুলো হলো:

ক. আল কুরআন থেকে দলিল

১. *আল্লাহর বাণী:*"পুরুষগণ নারীদের কাউয়াম (পরিচালক)- এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে একজনকে অপরের উপর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর পুরুষরা যেহেতু নারীর খরচ বহন করে। সেহেতু পুরুষকে তাদের উপর পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে"।[৯]

তাদের মতে, এ আয়াতে পুরুষদেরকে স্ত্রীলোকদের 'কাউয়াম'– কর্তা, পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়ক বলে ঘোষণা করা হয়। সামাজিক নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব তাদেরই।[১০] এছাড়া, একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ইউনিট হলো পরিবার। আল্লাহ তাআলা যেখানে একটি মাত্র পরিবারের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব অর্পণ করেননি, কোটি কোটি পরিবার নিয়ে যে রাষ্ট্র- তার দায়িত্বভার ও নেতৃত্বের বোঝা নারীর উপর তিনি কীভাবে

চাপাতে পারেন? সুতরাং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ইসলামে সামাজিক, দলীয় বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নারীদের জন্য নয়।[১১]

২. আল্লাহর বাণী: 'আর নারীদের উপর পুরুষের এক ধরনের প্রাধান্য রয়েছে'।[১২] এ আয়াতে দারাজাত বা প্রাধান্য নেতৃত্বের।

৩. আল্লাহর বাণী:"তোমরা (নারীরা) তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং বিগত কালের চরম জাহেলিয়াতের ন্যায় প্রশাধনী মেখে উন্মুক্তভাবে জনসম্মুখে বাইরে বেরিও না"।[১৩]

তারা বলেন, নারী তার স্বামীর ঘরে রাণী। ঘর দেখাশোনা, ঘরোয়া কাজের ব্যবস্থাপনা, সন্তানদের লালন-পালন ও সুযোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা প্রভৃতি তার দায়িত্ব। ঘরের বাইরের জীবন সংগ্রাম, চেষ্টা সাধনা ও দৌড়াদৌড়ি থেকে মুক্ত হয়ে নারী তার ঘর সামলাবে, ঘর সংশোধন করবে, জাতির ভবিষ্যতে সন্তানদের মানুষ করে গড়ে তুলবে। এটাই তার মূল ও মৌলিক দায়িত্ব। সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং দেশ শাসন নারীদের কর্মসীমা বহির্ভূত।[১৪]

তাদের মতে সামাজিক, দলীয় বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে আসীন হলে নারীকে প্রায় সবসময় বাইরে যেতে ও থাকতে হবে। প্রয়োজনেই কেবল ঘরে আসা সম্ভব হবে। বাধ্য হয়ে আল্লাহর বিধানের উল্টোটাই সে করবে। এতে আল্লাহর পুরো ব্যবস্থাটাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাই ইসলামে নারী নেতৃত্ব জায়েয নেই।[১৫]

৪. আল্লাহর বাণী: "আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে"।[১৬]

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে তাদের বক্তব্য হলো: মুসলিম উম্মাহর নেতা হিসেবে নামায কায়েমের প্রধান দায়িত্ব সরকার প্রধানের। তিনি নিজে নামাযী হবেন এবং জাতির ইমামতি করবেন। শরিআহতে এটা স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বসম্মত বিধান যে, নামাযে পুরুষদের ইমামতি করা নারীর জন্য জায়েয নেই।[১৭]

খ. হাদিস থেকে দলিল প্রমাণ

১. হযরত আবু বাকারাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেন, "যে জাতি তাদের বিষয়াদির উপর নারীদেরকে কর্তৃত্ব প্রদান করে, সে জাতি কখনো কল্যাণ পাবে না, সফল ও সার্থক হবে না"।[১৮]

তাদের মতে, এ হাদিস রাষ্ট্রে নারী নেতৃত্ব জায়েয না হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল। অধিকাংশ আলিম সার্বিক কর্তৃত্ব প্রয়োগে নারী নেতৃত্ব বা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এ হাদিসটিকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাওকানী রহ. বলেন, হাদিসের ভাষ্য মতে তাদের নেতৃত্বে বসানো হালাল নয়, তথা হারাম। কেননা যে বিষয় আবশ্যিকভাবে অকল্যাণ ডেকে আনে তা পরিহার করাও আবশ্যিক (ওয়াজিব)"।[১৯] তিনি আরো বলেন,"সফলতা বা কল্যাণ তিরোহিত হওয়ার বিষয়টির চেয়ে প্রচণ্ড ধমকি আর কিছু নেই"।[২০]

২. জাবির ইবন সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেছেন, "সে জাতির কখনো কল্যাণ হবে না, যাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক হলো একজন নারী"।[২১] তবে হাদিসটিতে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী থাকায় এটি দুর্বল বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

৩. আবু বকর রা. বর্ণিত, মহানবি সা. বলেন, 'পুরুষরা ধ্বংস হয়েছে, যখন তারা নারীর আনুগত্য করেছে, পুরুষরা ধ্বংস হয়েছে যখন তারা নারীর আনুগত্য করেছে'।[২২] তাদের মতে হাদিসটিতে নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, হাদিস যাচাইকারী শুআইব আরনাউথ বলেন: হাদিসটির সনদে বাক্কার ইবন আবদিল আযীয (আবু বাকারাহ রা.-এর নাতি) একজন দুর্বল রাবী। এজন্য হাদিসটি দুর্বল।[২৩] কিন্তু হাকিম স্বীয় 'মুস্তাদরাকে ' হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[২৪]

৪. মহানবি সা. বলেন, বিচারক তিনজন। তন্মধ্যে একজন জান্নাতে, আর দু'জন দোযখে। যিনি জান্নাতে তিনি সেই পুরুষ ব্যক্তি, যে সত্য জানলো এবং সে মোতাবেক ফয়সালা দিল। আর যে পুরুষ সত্য জেনেও ফয়সালায় যুলম করলো সে দোযখে। আর যে পুরুষ অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফয়সালা দিল সেও দোযখে"।

শাওকানী উল্লেখ করেন, এ হাদিসে বিচারক হিসেবে বার বার শুধু পূরুষ ব্যক্তি (رجل) বলা হয়েছে। তাই এর দ্বারা নারী বিচারক হবে না - তাই বুঝানো হয়েছে।[২৫]

৫. বর্ণিত হাদিস, একদা আবু যর বলেন, হে আল্লাহর রসুল সা.! আপনি আমাকে কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব দিবেন কি? তখন তিনি বললেন, হে আবু যর! তুমি দুর্বল। আর ঐ দায়িত্বটি আমানত। এটির হক বা দাবি যারা পুরণ করে এবং দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য এটি কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুসুচনার উপলক্ষ্য হবে"।[২৬]

তাদের মতে এ হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, দুর্বলদেরকে প্রশাসনিক নেতৃত্ব দেয়া যায় না। আর নারীরা শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে দুর্বল।

৬. *সাহাবিগণের বক্তব্য*: আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন: "তাদেরকে (নারীদেরকে) সেভাবে পিছনে রাখ, যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে রেখেছেন"।[২৭]

আল মাওয়ারদী বলেন: "যেহেতু তাদেরকে পিছনে রাখা ওয়াজিব, সেহেতু তাদেরকে (নেতৃত্ব দিয়ে) আগে বাড়িয়ে দেয়াও হারাম হয়েছে"।[২৮]

গ. ইজমা থেকে দলিল

কুরআন-সুন্নাহর এসব সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে সর্বযুগে গোটা উম্মাহর অধিকাংশ নারী নেতৃত্বকে নাজায়েয বলেই অভিমত ব্যক্ত করে এসেছেন। এটি হলো ইজমায়ে উম্মাত। ইজমায়ে উম্মাত শরিআহতের একটি অকাট্য দলিল।[২৯]

ঘ. সৃষ্টিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি

প্রথমত: তাদের মতে নারী পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগত পার্থক্য রয়েছে। তাদেরকে হাদিসে বলা হয়েছে তারা: আকল তথা বুদ্ধিগত স্বল্পতা ও ধর্মপালনে ঘাটতি যুক্ত (ناقصات عقل ودين)।[৩০] তাদের দু'জনের সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান। তারা পূর্ণ মাসের সালাত ও সিয়াম পালন করতে পারে না হায়েযের কারণে।

দ্বিতীয়ত: সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে ভবিষৎ প্রজন্ম গড়ার তথা সন্তান লালন পালনের কঠিন দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এজন্য তাদের যুক্তি বিদ্যা কম দিয়ে আবেগ মমতা বেশি দেয়া হয়েছে। তারা দ্রুত ভুলে যায়। তারা নেতৃত্বের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়লে মানবসমাজে আদর যত্নে সন্তান লালন পালনের এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বিঘ্নিত হবে।

তৃতীয়ত: তাদের মতে শরিআহর বিধানের আলোকে নারীসমাজ নেতৃত্বের সেই দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। এরূপ ক'টি সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ:

১. নারীরা কোনো অবস্থাতেই নামাযে ইমামতি করতে পারবে না।

২. যাঁর উপর জামাআতে নামায পড়া ওয়াজিব নয়।

৩. যিনি কখনো জামাআতে শামিল হলেও সব পুরুষের পেছনেই তাঁকে দাঁড়াতে হয়।

৪. যাঁর প্রতি মাসে হায়েয তথা কিছুদিন এমন অবস্থা হয়, যখন মসজিদে প্রবেশ করা তাঁর জন্য নাজায়েয থাকে।

৫. যাঁর উপর জুমা ফরয নয়।

৬. যাঁর পক্ষে কোনো জানাযার সাথে যাওয়া জায়েয নয়।

৭. কোনো মুহরম সাথে না নিয়ে সফরে যাওয়া যাঁর জন্য নিষেধ। এমনকি মুহরেম না পেলে আমৃত্যু হজ পর্যন্ত করা জায়েয নেই। এ অবস্থায় বদল হজের অসীয়ত করে যেতে হয়।

৮. যাঁর উপর জিহাদ ফরয নয়।

৯. বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে যাওয়া যাঁর জন্য জায়েয নয়।

১০. এমনকি নিজের ঘরে পর্যন্ত যিনি পরিবার প্রধান হতে পারেন না।[৩১]

মালেকি মাযহাবের ফকীহ ইবনুল আরাবী বলেন: "নারী এমন নয়, যে মজলিশে বের হতে পারে, পুরুষের সাথে মুক্ত মেলামেশা করতে পারে, একজন সমকক্ষ আরেকজন সমকক্ষের ন্যায় আলোচনা করতে পারে, কারণ সে যদি যুবতী হয়, তার দিকে দৃষ্টি দেয়া, কথা বলা হারাম। তিনি যদি সতী সাধ্বী বৃদ্ধা মহিলাও হন, তিনি তো পুরুষদের সাথে একই মজলিশে একত্রিত হতে পারেন না, ঠেসাঠেসি করে ভীড় জমাতে পারেন না"।[৩২]

অবৈধ মতের দাবির পক্ষে দলিলসমূহের পর্যালোচনা

প্রথমত: আয়াতে قوامون শব্দটি قوام এর অর্থ রক্ষক। এটা পারিবারিক ক্ষেত্রে। এজন্য ভরণ পোষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরুষের উপর। পরিবারের বাইরে কোনো নারীর ভরণপোষনের কথা বলা হয়নি।

দ্বিতীয়ত: ঘরে অবস্থান করার জন্য আল কুরআনের নির্দেশটি রসুল সা.-এর স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট। এ নির্দেশ সার্বিক নয়। এরূপ অনেক বিশেষ নীতিমালা রয়েছে। যেমন আল কুরআনের একই সুরায় এসেছে, সাধারণ নারীগণের ব্যাভিচারে যে শাস্তি হবে মহানবি সা.-এর স্ত্রীগণের সেরূপ ক্ষেত্রে ঐ শাস্তির দ্বিগুণ দিতে হবে।[৩৩]

তৃতীয়ত: পুরুষকে নেতৃত্বে প্রাধান্য দেয়া মানে নারীকে নেতৃত্ব থেকে একেবারে বঞ্চিত করা নয়।

চতুর্থত: এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ একমাত্র হযরত আবু বাকারাহ রা. থেকে বর্ণিত। এছাড়া, এ হাদিসের সনদেও ত্রুটি রয়েছে।

পঞ্চমত: আর আবু বাকারাহ রা.-এর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য প্রদান করা হয় যে, তিনি তায়েফ অভিযানের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, এটি মহানবি সা.-এর সময়কালের শেষ পর্যায়ে। এটি রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত। এর ভাষ্য শরিয়াতের একটি মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট। অথচ হাদিসটি ২৫ বছর পর্যন্ত আর কেউ জানতেন না। শুধু আবু বাকারাহ রা. ২৫ বছর পর বললেন।

মাও. আকরম খাঁ বলেন, হাদিসটির ভাষাতে অসংলগ্নতা (ইদতিরাব) রয়েছে।.... ৩৬ হিজরিতে উম্মাহর মাঝে বিবাদের এক ক্রান্তি কালে অনুষ্ঠিত জামাল যুদ্ধে হাজার হাজার সাহাবি রা. অংশগ্রহণ করলেন। তারা কেউই হাদিসটি সম্পর্কে জানলেন না। সেই সময়কার বর্ণিত এবং গোত্রগত প্রতিহিংসা ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেওয়াতগুলোর মূল্যমর্যাদা নির্ধারণের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।[৩৪]

কারো মতে, এ হাদিস বর্ণনা দ্বারা হযরত আয়েশা রা.-কে হেয় করাই উদ্দেশ্য। ইবন হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন: ইবন বাত্তাল এক সুত্রে মুহাল্লাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আবু বাকারাহ বর্ণিত হাদিসটি বাহ্যত হযরত আয়েশা রা. যা করলেন সে বিষয়ে তাঁর মতামতকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রতি ইঙ্গিত করে"।[৩৫]

কারো মতে এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৬] এটি আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বর্ণিত। এছাড়া, আবু বাকারাহ রা.-কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অপরাধে উমর রা. বেত্রাঘাতের দণ্ড আরোপ করেছিলেন। যারা এ দন্ডে দন্ডিত তাদের সাক্ষ্য শরিয়াতে গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ হাদিসও গ্রহণযোগ্য নয়। এ রূপ অনেক সমালোচনা করা হয়।

কিন্তু এর উত্তরে বলা হয়: হাদিসটি সহিহ বুখারিতে এসেছে, যার উপর গোটা উম্মাহ আলিমগণের অধিকাংশ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। এছাড়া, সাক্ষ্য দেয়া ও হাদিস বর্ণনা করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। উম্মাহর অধিকাংশ ফকীহগণ এ হাদিসটিকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই হাদিসটিকে শায বা দুর্লভ বলা ঠিক নয়। এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও প্রচলিত। আর মহানবি সা.-এর সাহাবিগণ বিশ্বস্ত। সম্ভবত এজন্য শায়খ মুহাম্মদ গায্যালি বলেছেন, হাদিসটি সনদ ও মতনের দিক দিয়ে সহিহ। তবে এটি বিশেষ প্রেক্ষাপটের সাথে জড়িত। তিনি বলেন: "রসুল সা. সত্য কথাই বলেছেন। এটা ছিল সেখানকার পুরো পরিস্থিতির চিত্রায়ন। সে সময়ের পারস্যে যদি মজলিশে শুরাভিত্তিক ব্যবস্থা থাকতো, আর গোল্ড মাইর নামে ইহুদি নারীর মত শাসক থাকতো যে কিনা ইসরাইল শাসন করেছে, তাহলে সেখানকার পারস্যের বিষয় অন্য রকম মন্তব্য হতো।..." তিনি আরো বলেন: "মহানবি সা. মক্কায় সুরা নামাল মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। সেখানে তাদের কাছে সাবা রাণীর কিস্সাও বর্ণনা করেন, যে নারী স্বীয় প্রজ্ঞা ও প্রখর মেধায় তার জাতিকে সফলতা ও নিরাপত্তার দিকে পরিচালনা করেন। আর এটা অসম্ভব যে, সেখানে সে নবি সা. তাঁর হাদিসে এমন হুকুম দিবেন যা কুরআনের ঐ ওহির বিরোধী হয়!! কোনো জাতি কী ব্যর্থ হয়েছে এ ধরনের উৎকৃষ্ট মানের একজন নারীর নেতৃত্বে"?![৩৭]

এজন্য বর্তমানে অনেকের মতে সম্ভবত মহানবি সা.-এর উদ্দেশ্য ছিল এটা বুঝানো যে, পারস্যবাসীরা নারীদেরকে নেতা বানিয়েও সফল হবে না। এর ভাষ্য সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বা এটি সার্বিক নয়। এটা মহানবি সা.-এর কোনো নির্দেশ ছিল না যে, 'তোমরা নারীদেরকে নেতা বানাবে না'।

অপরদিকে এসব বক্তব্যও সমালোচিত হয়েছে। বলা হয়, হাদিসটির ভাষ্য সার্বিকভাবে প্রযোজ্য। কেননা শরিআহর মূলনীতি অনুসারে দলিলের ভাষ্য দ্বারা কি বুঝাচ্ছে, সেটাই বিবেচ্য। বিশেষ ঘটনা বা প্রেক্ষাপটের সাথে এটি নির্দিষ্ট নয়। (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)[৩৮] হাদিসে জাতি (قوم), কর্তৃত্ব (أمر) সাধারণভাবে এসেছে। এটি অনির্দিষ্টজ্ঞাপক (نكرة) শব্দ। এগুলো থেকে প্রমাণিত যে, হাদিসের ভাষ্য বিশেষ ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী (عام)।

এ বক্তব্যের পর্যালোচনায় ড. কারযাভী বলেন: এটা ঠিক যে, অধিকাংশ উসূলবিদদের মতে, কোনো বক্তব্যের ভাষ্য বিশেষ প্রেক্ষাপটের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং সার্বিক'। কিন্তু এ মূলনীতির সাথে সকলে একমত নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. ও ইবন উমর রা. ঘটনার প্রেক্ষাপটের আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়াকে অধিক পছন্দ করতেন। অন্যথায় বিভিন্ন ধরনের ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, বক্তব্য অসংলগ্ন হয়। যেমনিভাবে খারেজীদের হারুরিয়া উপদলসহ আরো কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যে সব আয়াত মুশরিকদের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়, সেগুলোকে মু'মিনদের উপর আরোপ করে'।[৩৯]

তিনি আরো বলেন, মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ প্রায় একমত যে, উপরোক্ত হাদিসটি নারীকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব তথা আল ইমামাতুল কুবরার পদে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাদিসটি যে প্রেক্ষাপট নিয়ে, সেটা তাই প্রমাণ করে। আর সেটা হয় যদি কোনো নারীকে সমগ্র মুসলমানদের নেতা বা ইমাম বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে ১৯২৪ খ্রি. কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক উসমানী খিলাফতের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার পর সে ধরনের ইমামত বা নেতৃত্ব মুসলিম উম্মাহর মাঝে নেই। অতএব অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। হাদিসের ভাষ্য অনুসারে কোনো নারীকে যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা সম্রাজ্ঞী সদৃশ বানিয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়, সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই হাদিসটি সকল ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন অঞ্চলে নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারী নেতৃত্বের বিরোধিতাকারীদের বিরোধিতায় কেউ কেউ বলেন, বর্তমানে আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহ অতীতের বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রশাসনের মতো।[৪০]

এ হাদিসের পর্যালোচনায় অনেকে বলেছেন, নারীরা নেতৃত্বে সর্বক্ষেত্রে বা সর্ব সময়ে ব্যর্থ এটা ঠিক নয়। তাদের কেউ কেউ কখনো কখনো সফল হতে পারে। এমনকি কুরআনে এরূপ একজন নারী নেত্রীর কথা উল্লেখ আছে। যিনি পরামর্শ ভিত্তিতে কাজ করতেন এবং নিজ প্রজ্ঞায় স্বজাতিকে এক ভয়াবহ যুদ্ধ বা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন।[৪১]

কারো মতে হাদিসটি উপদেশমূলক। এটি হুকুমমূলক নয়। অন্যথায় নারীনেতৃত্ব অবৈধ হলে মহানবি সা. মুসলমানদের জন্য করণীয় হিসেবে আরো সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে হুকুম বলে দিতেন।

একইভাবে হযরত জাবির ইবন সামুরাহ রা.-এর বর্ণনাটির সনদে হায়ছামীর মতে একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত। সেহেতু এটি দুর্বল হাদিস।

ষষ্ঠত: সকল নারী দুর্বল এ কথাটি কোনো হাদিসে সরাসরি বা স্পষ্ট করে কোথাও বলা নেই। তাই অন্য কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে কিয়াস বা তুলনা করে সিদ্ধান্ত দেয়া সঠিক হবে না।

সপ্তমত: অবৈধতার উপর ইজমা হয়েছে বলে যে দাবি করা হয়, তাও সঠিক নয়। তাহলে মতবিরোধ হলো কী করে? অতীতে অনেক আলিম বৈধতার পক্ষেও ছিলেন।[৪২]

অষ্টমত: নারীরা কোনো অবস্থাতেই সালাতে ইমামতি করতে পারবে না - এ কথাটি সঠিক নয়। উম্মে ওয়ারাকাহ বিনতি নাওফাল রা.-কে তার ঘরে সালাতে ইমামতির জন্য মহানবি সা. অনুমতি দিয়েছিলেন।[৪৩] অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, সেখানে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আযান দিত।[৪৪] রসুল সা. যুগেও আয়েশা রা. ও উম্মে সালামাহ রা. মহিলাদের নিয়ে ঘরে জামাতে সালাতে ইমামতি করেছেন। তবে সামনে না গিয়ে কাতারের ভিতরে থেকেছেন। মহানবি সা. নিজেও তা দেখেছেন ও অনুমোদন দিয়েছেন।[৪৫]

নবমত: হযরত আয়েশা রা. উম্মাহাতুল মু'মিনীনের অন্তর্গত মুজতাহিদ সাহাবি। তিনি জামাল যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে ঘর থেকে বের হয়েছেন। কেউ হিজাব অবলম্বন করে বের হলে আল কুরআনের

দৃষ্টিতে দোষণীয় নয়। দলবদ্ধ হয়ে বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিমানে নারীদের মাহরিম ছাড়া একা হজসহ অন্যান্য উদ্দেশ্যে বের হওয়া বা ভ্রমণকে অনেক আলিম বৈধ বলেছেন। সমাজের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হতে পারে। রসুল সা. অন্য হাদিসে নারীদের নিরাপদ একাকী ভ্রমণের ভবিষৎ বাণী দিয়েছেন। সহিহ বুখারিতে এসেছে, মহানবি সা. আদী ইবন হাতিম রা.-এর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: 'হে আদী! তোমার জীবন যদি দীর্ঘ হয়, তা হলে তুমি অবশ্যই দেখবে হীরাত[৪৬] থেকে হাওদাজে মহিলা সফর করবে আর এভাবে কাবায় এসে তাওয়াফ করবে, রাস্তায় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না'।[৪৭]

এজন্য তাবেঈ হাসান বাসরী, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ (এক বর্ণনায়), ইমাম গায্যালি, মাওর্য়াদী, ইবন তাইমিয়াসহ অনেক আলিম মাহরিম ব্যতীত নারীর হজে বা সফর বৈধ বলেছেন অন্যান্য একাধিক বিশ্বস্ত নারীদের সাথে বের হওয়া বা নিরাপত্তা বিধানের শর্তে।[৪৮] এক হাদিসে এক দিনের বা এক রাত্রের সফরের ভ্রমণে মাহরিম থাকার কথা বলা হয়। অন্য বর্ণনায় দুই বা তিন দিনের কথাও আছে।[৪৯]

আজকে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বিমানে মক্কা বা একটি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে কয়েক ঘন্টা প্রয়োজন। পূর্ণ দিবসের প্রয়োজন নেই। সুতরাং নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে নারী নেতৃত্ব বৈধ মনে করার পথে বাধা থাকে না।

দশমত: নারীকে প্রধানত ঘরে অবস্থান করতে বলা হয় পারিবারিক দায়িত্ব বিশেষত সন্তান-সন্ততি লালন পালনে অধিক গুরুত্ব দেয়ার জন্য। যাদের সন্তান সাবালক হয়ে গেছে, নিজের কাজ নিজে করতে সক্ষম, সেই সব নারীর ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় অভিমত: সকল ক্ষেত্রে সব ধরনের নারী নেতৃত্ব বৈধ

অতীতে ফকীহগণের মধ্যে কেউ কেউ সাধারণভাবে নারী নেতৃত্ব বা কর্তৃত্বকে সঠিক বা সহিহ বলেছেন:

হানাফি ফকীহ ইবন নুজাইম (৯২৬হি - ৯৭০হি.) বলেন "সে নারীর সালতানাত সহিহ তথা সঠিক। মিসরের সালতানাতে এক নারী অধিষ্ঠিত হয়েছিল। যার নাম শাজারাতুর দুর্‌রা। যিনি ছিলেন বাদশা সালিহ ইবন আইয়্যুব এর দাসী"।[৫০] পরবর্তীতে বধূ।[৫১]

ইবন জারীর তাবারীও সকল ক্ষেত্রে নারীর শাসন বা হুকুমতকে বৈধ বলেছেন। ইবন রুশদ বলেন: "তাবারী বলেন, 'প্রত্যেক ক্ষেত্রে বা সকল বিষয়ে নারী হাকিম (সিদ্ধান্ত প্রদান কারী) বা শাসক হওয়া বৈধ"।[৫২]

আধুনিককালে কিছু আলিম ও আধুনিকতাবাদী মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের মতে রাষ্ট্র প্রধান হওয়া (ইমামত)সহ সকল ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব বৈধ। মিসরের শায়খ মুহাম্মদ আল গায্যালি সহ আরো অনেক আলিম এ মত পোষণ করেন।[৫৩] শায়খ মুহাম্মদ আল গায্যালি আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার নারীদের দিকে ইশারা করে বলেন: "তারা (আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা) যদি সম্মত হয় যে, নারীদেরকে শাসক অথবা বিচারক কিংবা মন্ত্রী বা

রাষ্ট্রদূত হোক, তারা যা ইচ্ছা করার অধিকার রাখে। আর আমাদের ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আর সেটা হলো নারীর এ সমস্ত পদে অধিষ্ঠিত হওয়া বৈধ"।[৫৪]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গীয় অঞ্চলে মাও. আকরম খাঁ ইসলামের খিলাফতের বিধান মতে নারী পুরুষ উভয়ে যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারবে বলে মত দিয়েছিলেন। তাঁর মতে সৃষ্টিগত দিক দিয়ে নারীরা মাতৃত্বের স্বরূপে এবং পুরুষরা আল্লাহর হুকুমত পরিচালন ও সংরক্ষণে সক্ষম। উভয়ের সৃষ্টিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও কখনো এর তারতম্য তথা ব্যতিক্রম হবে না, তা বলা যায় না। কুরআন সুন্নাহেও এরূপ তারতম্য না হওয়ার পক্ষে কোনো সমর্থন নেই।[৫৫] লাহোরের প্রফেসর রফীউল্লাহ শিহাব, জাভীদ জামাল দাসকাভী সহ আরো অনেকে।[৫৬]

এমত পোষণকারীগণও কয়েক ধরনের দলিল পেশ করেন। যেমন:

১. *আল্লাহর বাণী:* "অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা মহিলা আ'মলকারীর আ'মল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ"।[৫৭]

   এতে বুঝা যাচ্ছে, কাজে কর্মে নারী পুরুষের সমঅধিকার। তাই নারীরাও পূরুষের মত নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার রয়েছে।

২. *আল্লাহর বাণী:* "তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের খিলাফত প্রদান করবেন"।

   তাদের মতে এখানে খিলাফত লাভের যোগ্যতার জন্য দুটি শর্ত করা হয়, তা হলো: ইমান ও আমাল সালিহ বা নেক কাজ। এখানে নারী পুরুষ পার্থক্য করা হয়নি।[৫৮]

৩. *আল্লাহর বাণী:* "আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা একে অপরের সহযোগী বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজে নিষেধ করে, আর সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে"।[৫৯]

   এ আয়াতে মু'মিনদেরকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে নারী পুরুষ ভেদাভেদ করা হয়নি। আর নেতৃত্বও একটি রাজনৈতিক তৎপরতা। এখানে নারী পুরুষ সমান।[৬০]

৪. *সাবা সম্রাজ্ঞীর প্রজ্ঞার প্রশংসা:* ইয়ামানে প্রাচীনকালে সোলায়মান আ.-এর সমসাময়িক সাবা অঞ্চলে এক প্রতাপশালী নারী শাসন করেছেন। আল কুরআনে বর্ণিত, সংবাদ সংগ্রাহক হুদহুদ বলে: 'আমি এক নারীকে দেখতে পেলাম, সে তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে দেয়া হয়েছে সব কিছু। আর তার আছে এক বিশাল সিংহাসন'।[৬১]

   তৎকালীন আল কুদস নগরীতে ইসরাইল রাষ্ট্রনায়ক সোলায়মান আ. এ নারীকে ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর আনুগত্যের আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেন। এ বিষয়ে দম্ভ প্রদর্শন না করার জন্য সতর্ক করেন। তখন এ সম্রাজ্ঞী কিছু খোজ খবর নিয়ে নিজ সভাসদকে ডেকে চিঠির কথা বলেন এবং পরামর্শ নিলেন। তারা

বলল, আমরা শক্তিশালী। অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিরোধ করব। তবে সর্বময় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আপনার। কিন্তু সম্রাজ্ঞী দ্বিমত করে বললেন, শক্তিশালী রাজারা কোনো এলাকায় প্রবেশ করলে সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের অপদস্ত করে। তখন তিনি উপঢৌকন পাঠিয়ে তাকে অধিকতর পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেন।[৬২]

সোলায়মান আ. তার আনুগত্য না মেনে উপঢৌকন পাঠানোকে পছন্দ করেননি। ফলে যুদ্ধের হুমকি দেন। এতে সম্রাজ্ঞী সশরীরে সোলায়মান আ.-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর অধীনস্ততা মেনে নিয়ে তার সাথে সন্ধি করে গোটা সাবা জাতিকে ভয়াবহ যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেন। এসব কাজে এ সম্রাজ্ঞীর অনন্য প্রজ্ঞার কথা ফুটে উঠেছে। সোলায়মান আ. তাকে অপসারণ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। এভাবে আল কুরআনেও তার প্রজ্ঞাপূর্ণ, দূরদর্শী ও পরামর্শভিত্তিক নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। উপরোক্ত মতানুসারীগণ বলেন, এতে বুঝা যায়, নারী নেতৃত্ব অবৈধ নয়।[৬৩]

তবে এ যুক্তিটিও সমালোচিত হয়েছে। আল্লামা আলূসী বলেন: "এ আয়াতে এমন কিছু নেই যা প্রমাণ করে যে, নারী সম্রাজ্ঞী হওয়া জায়েয। আর কাফির জাতির কোনো কাজের দ্বারা উক্ত মতের পক্ষে কোনো দলিল হয় না"।[৬৪]

আলূসীর এ কথা দ্বারা বুঝা যায়, তার সময়েও আয়াতটি নারী সাম্রাজ্ঞী হওয়ার বৈধতার পক্ষে দলিল হিসেবে কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা, যেহেতু আল কুরআনে ঐ নারীর কথা এসেছে এবং তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও গণতান্ত্রিকতা তুলে ধরে প্রশংসা করা হয়েছে এবং একইভাবে নবি সোলায়মান আ. ঐ মহিলার শাসন স্থিতাবস্থায় রেখেছেন, সেহেতু এটাকে নারী নেতৃত্বের পক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা অমূলক নয়। তবে নেতৃত্বটি কোন পর্যায়ের ছিল, সেটা বিবেচ্য। কারণ ঐ নারী সোলায়মান আ.-এর বশ্যতা স্বীকার করা এবং পরবর্তীতে তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে শাসন চালানোর দ্বারা সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করেননি। পরবর্তীতে সে নারীর ক্ষমতা বা নেতৃত্ব ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক।

৫. মুনাফিক নারীরা সংঘবদ্ধভাবে সমাজবিরোধী কাজ করবে, আর মু'মিন নারীরা নিরবে শুধু দেখবে তা সঠিক নয়। ইরশাদ হয়েছে, "মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের অংশ, তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়, আর ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে"।[৬৫]

৬. *খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগ:* উমর রা. শিফা নামে এক মহিলাকে বাজার তদারকির দায়িত্বে নিয়োগ দিয়ে ছিলেন। তার এ কর্তৃত্ব সার্বজনীন ছিল। নারী পুরুষ সকলের উপর এ মহিলা কর্তৃত্ব করেছেন।[৬৬]

৭. *উষ্ট্র যুদ্ধে হযরত আয়েশা রা.-এর নেতৃত্ব:* তিনি মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা উসমান রা.-এর হত্যার বিচারের দাবিতে মক্কা থেকে সাহাবি ও তাবেঈগণকে সংগঠিত করেন ও তাদের সামনে বক্তব্য প্রদান করেন। এমনকি বিভিন্ন গোত্র প্রদানদের নিকট চিঠি দিয়েও তাদেরকে প্রভাবিত ও একত্রিত করেন। ফলে আলি রা.-এর অনুসারীদের সাথে ৩৬ হিজরি/ ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় অনুষ্ঠিত হয় জামাল বা উষ্ট্র যুদ্ধ।

তিনি আলি রা. তাঁর সাথে পত্র বিনিময় করে শেষ পর্যায়ে উভয়ে সন্ধির প্রস্তাবে একমত হন। তবে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু মুনাফিকের চক্রান্তে উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের দ্বারা ভোর বেলায় হঠাৎ আক্রমণে কিছু লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আয়েশা রা. পর্দায় থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে হযরত আলি রা.-এর দ্রুত পদক্ষেপে ও আয়েশা রা.-এর মদিনায় ফিরে যাওয়ার শর্তে যুদ্ধ প্রশমিত হয়। যাহোক, জামাল যুদ্ধে আয়েশা রা.-এর সাথে ত্রিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ ঘটে।[৬৭] যাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সাহাবি, অন্যরা ন্যুনতম পক্ষে তাবেঈ। তিনি তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর সামষ্টিক নেতৃত্ব, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামরিক প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব সবই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। এসব পদক্ষেপে তাঁর সাথে অংশগ্রহণকারী এ বিশাল সংখ্যক সাহাবি ও তাবেঈন কোনো আপত্তি করেছেন বলে প্রমাণ নেই। এসব প্রমাণ করে নারী নেতৃত্ব বৈধ।[৬৮]

এ দলিলের পর্যালোচনায় বলা হয়, হযরত আয়েশা রা.-এর নেতৃত্ব একচ্ছত্র ছিল না। তাঁর সহযোগী ছিল হযরত যুবায়ের রা. ও তালহা রা.। তাছাড়া, এ নেতৃত্ব ছিল বিশেষ পরিস্থিতিতে। কারণ ঐ ঘটনার পর তিনি নেতৃত্ব প্রদানমূলক আর কোনো পদক্ষেপ নেননি।

৮. *ঐতিহাসিক প্রমাণ:* ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক মুসলিম নারী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তারা সরকার প্রধান বা কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন। তারা ইতিহাসের ক্রান্তি লগ্নে জাতির নেতৃত্বের হাল ধরে তাদের জাতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখেন। তন্মধ্যে: খারেজীদের হারুরী শাবীবাহ উপদল নেতা হিসেবে গাযালাহ (মৃ.৭৭ হি./৬৯৬ খ্রি.) নেতৃত্ব, মিসরের ফাতেমী শাসনামলে সিত্তুল মুলূক (৯৭০-১০২৩ খ্রি.), হিন্দুস্থানের সুলতানা রাজিয়া বিনতে সুলতান ইলতুৎমিশ (৬৩৪-৬৩৭হি./ ১২৩৬-১২৪০ খ্রি.), মিসরের শাজারাতুদ দুররা (১২৪৯-১২৫০ খ্রি.), ভুপালের রাণী সেকান্দর বেগম (১৮১৬-১৮৬৮ খ্রি.), পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনযীর ভুট্টো (১৯৮৮-১৯৯০ খ্রি., ১৯৯৩-১৯৯৬ খ্রি.), বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া (১৯৯১-১৯৯৬, ২০০১-২০০৬ খ্রি.) এবং সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০১ খ্রি., ২০০৯ - বর্তমান), তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থানসো সিলার (১৯৯৩-১৯৯৬খি.), ইন্দোনেশিয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট মেঘবতী সুকার্ণ পুত্রী (২০০১-২০০৪ খ্রি.), সেনেগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মামে মেডিউর বুয়ে (২০০২-২০০২ খ্রি.), প্রমুখ। এসব প্রমাণ করে মুসলিম সমাজে নারীরাও নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। আলিমগণ কেউই এসব ঐতিহাসিক মুসলিম নারী নেত্রীদের নেতৃত্বের বিরোধিতা করেননি। তাই এটা প্রমাণ করে নারী নেতৃত্বের দাবিটি বাস্তবসম্মত।[৬৯]

৯. *শরিআহর আইন প্রণয়নে মূলনীতি হলো:* সাধারণভাবে মূলত সবকিছু বৈধ, যদি শরিআহ কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত না হয়।[৭০] তাই কুরআন হাদিসে কোথাও নারী নেতৃত্ব নিষেধ নেই। সেখানে বলা নেই যে, নারীদেরকে নেতৃত্ব দিবে না বা নেতা বানাবে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই নারী নেতৃত্ব বৈধ।

১০. *বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি:*

ক. নারীগণও সমাজের অংশ। এটি পরিচালনায় তাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত নেতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে। তাদের বংশানুক্রমিক প্রভাবও থাকতে পারে। যা নেতৃত্ব অর্জন ও প্রয়োগে প্রভাব বিস্তার করে। তাই তারা সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

খ. নারীরা সৎ ও মেধাবী হতে পারে।

গ. নিষেধ এসেছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব চর্চার ক্ষেত্রে। কিন্তু শুধু এ ক্ষেত্রে সীমিত নয়।

ঘ. বর্তমানে প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামষ্টিক নেতৃত্ব কার্যকর। এ ধরনের নেতৃত্ব হলে যেকোনো পর্যায়ের নেতৃত্বে নারী আসতে সক্ষম।

ঙ. সার্বিক নেতৃত্বে পুরুষদেরকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ এই নয় যে, নারীদেরকে বঞ্চিত করা। যোগ্যতা থাকলে নারীরাও নেতৃত্বের অধিকারী হতে পারে।

তৃতীয় অভিমতঃ মজলিশে শুরা ব্যবস্থায় বা যৌথ নেতৃত্বে রাষ্ট্রপ্রধানের পদসহ নারীর সকল ধরনের নেতৃত্ব বৈধ

রসুল সা.-এর বাণী: কোনো যদি জাতি কখনো সফল হবে না যদি তারা নারীকে তাদের কর্তৃত্বে বসায়। এ হাদিসের হুকুম সম্পর্কে মাও. আশরাফ আলি থানভী রহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি তখন ফাতওয়া দিতে গিয়ে বলেন: শাসন করার বিষয়টি তিন ধরনের:

এক. যেখানে কর্তৃত্ব পূর্ণ ও সার্বিক সার্বজনীন। যেখানে একচ্ছত্রভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তার উপরে অন্য কেউ ক্ষমতাধর নেই। তার ক্ষমতা সর্বোচ্চ। সেটা কোনো নির্দিষ্ট দল বা অঞ্চলের সাথে নির্ধারিত নয়। যেমন: রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতা। যিনি এককভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ইখতিয়ার রাখেন।

দুই. যেখানে কারো পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করেন, তবে সেটা সার্বজনীন নয়। যেমন: নির্দিষ্ট একটি দলের প্রধান হওয়া।

তিন. যেখানে কারো এককভাবে পূর্ণ ও সার্বজনীন ক্ষমতা হয় না। যেমন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতা। যেখানে শাসক মূলত মজলিশে শুরা তথা পরামর্শ কমিটির একজন সদস্য রূপে অবস্থান করেন। সেখানে মজলিশে শুরাই শাসক।

প্রথম ধরনের ব্যবস্থায় নারী শাসক হওয়া জায়েয নয়। অবশিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের ব্যবস্থায় একজন নারী প্রশাসক হওয়া জায়েয। আর এটাই আবু বাকারাহ বর্ণিত উপরোক্ত হাদিসের ভাষ্য।[৭১]

চতুর্থ অভিমতঃ বিশেষ অবস্থা বা প্রেক্ষাপটে নারীর রাষ্টপ্রধান সহ সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বৈধ

সৈয়দ আবুল আলাসহ বেশ কিছু আলেমের মতে যদি প্রেক্ষাপট এমন হয়, যেখানে নারীর চেয়ে অধিক প্রভাবশালী যোগ্যতর পুরুষ নেতা না থাকা বা নারী নেতৃত্বের বিকল্প না থাকা (সৈয়দ আবুল আলা)। ১৯৬৪

খ্রি. পাকিস্তানের স্বৈরশাসক জেনারেল আইয়্যুব খানের বিরুদ্ধে নির্বাচনে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহর বোন ফাতিমা জিন্নাহকে সৈয়দ আবুল আলাসহ অনেক আলিম সমর্থন করেছিলেন। তারা চেয়ে ছিলেন, যেকোনো উপায়ে আইয়্যুবকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। সৈয়দ আবুল আলা বলেন, এ পরিস্থিতিতে নারী নেতৃত্ব বৈধ হওয়াতে কোনো বাধা নেই।[৭২]

পঞ্চম অভিমত: বিশেষ ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব বৈধ

অনেক আলিমের মতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব বৈধ। যেমন:

ক. বিচারিক কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে: মুসলিম ফকীহগণের অধিকাংশের মতে বিচারিক কাজে নারীদের নিয়োগ বৈধ নয়। তবে অনেকের মতে নারীদের বিচারিক কাজ বৈধ। এমতটি হলো হাসান আল বাসরী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক (এক বর্ণনায়),[৭৩] মালেকি মাযহাবের ইমাম ইবনুল কাসিম,[৭৪] ইমাম ইবন জারীর তাবারী, ইমাম ইবন হাযাম প্রমুখের। তবে ইমাম আবু হানিফার মতে যেসব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বৈধ, সেসব তাদের বিচার কাজও বৈধ। যেমন: ব্যবসায়িক লেনদেন, পারিবারিক আদালতে ইত্যাদি।

অনেকে বর্ণনা করেন যে, ইবন জারীর তাবারীর মতে সার্বিক ক্ষেত্রে নারী বিচারক হতে পারে এবং হওয়া বৈধ।[৭৫]

মালেকি মাযহাবের ফকীহ ইবন রুশদ উল্লেখ করেন: "তাবারী বলেন: প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই একজন নারী হাকিম (বিচারক) হওয়া জায়েয"।[৭৬]

মালেকি মাযহাবের ফকীহ ও ব্যাখ্যাকার ইবন আবী মারয়াম এর বর্ণনা মতে ইমাম ইবনুল কাসিম আল মালেকি মনে করতেন, সার্বিক ক্ষেত্রে নারীকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া বৈধ। ইবন আবদিস সালাম বলেন, সম্ভবত তিনি হাসান বাসরী ও তাবারীর ন্যায় নারীকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়াকে সাধারণভাবেই বৈধ মনে করতেন। অবশ্য ইবন যারকূনের বর্ণনা মতে ইবনুল কাসিম এর মতটি ছিল ইমাম আবু হানিফার মতো। তিনি মনে করতেন, যে সব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বৈধ, সেখানে বিচার করাও বৈধ। মালেকি মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আল হাত্তাব এ বর্ণনাটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[৭৭]

শাফেঈ মাযহাবের শায়খ উপাধীধারী আবুল ফারজ ইবন তিরার-এর মতে সকল ক্ষেত্রে বিচারিক কাজে নারীদের কর্তৃত্ব বৈধ। তিনি বলেন: 'এর পক্ষে দলিল হলো হুকুম আহকাম চালুর উদ্দেশ্য হলো বিচারক কর্তৃক হুকুম-আহকাম কার্যকর করা, বিভিন্ন পক্ষের দলিল শ্রবণ করা, বাদী-বিবাদীর মাঝে বিবাদ মিমাংসা করা। আর এসব কাজ একজন পুরুষের পক্ষে যেমনিভাবে সম্ভব, নারীর পক্ষেও সম্ভব'।[৭৮]

ইবন হাযম নারীদেরকে খিলাফতের আসনে বসানো জায়িয মনে না করলেও[৭৯] সকল ক্ষেত্রে তাদের বিচার কাজ বৈধ বলেছেন। তাঁর মতে সকল ক্ষেত্রে নারীরা সাক্ষ্য দিতে পারে। আর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বিশ্বস্ত হওয়া শর্ত। আর কিছু নয়। এখানে নারী পুরুষ ভেদাভেদ নেই।[৮০] যে কারো পক্ষে ও বিপক্ষে প্রত্যেক বিশস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য"।[৮১]

এখানে সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিষয়কে আলাদা করা হয়নি। তেমনি বিচারের ক্ষেত্রেও। বিচারক হওয়ার শর্তসমূহ উল্লেখ করতে যেয়ে বলেন, মুসলমান ও যিম্মীদের কোনো বিষয়ে কারো বিচার কাজ ও হুকুম জারী করা হালাল নয় একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যিনি মুসলিম, বালিগ, বুদ্ধিমান এবং কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান সম্পন্ন।[৮২] এখানে নারী পুরুষ ভেদাভেদ করা বা পুরুষ হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি।

তবে হানাফি মাযহাবের অধিকাংশের মতে কিসাস ও হদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ বৈধ নয়। শারহ আদাবুল খাসসাফে রয়েছে: "কিসাস ও হাদ্দ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী বিচারিক দায়িত্ব পালন করতে পারে"।

তারা কুরআন হাদিসে দলিলের উপর কিয়াস করেছেন। তাদের মতে কুরআন হাদিসে নারীদের সাক্ষ্য দেয়ার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, বৈধ বলা হয়েছে। সেহেতু যেসব ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বৈধ, বিচার করাও বৈধ। হানাফি মাযহাবের 'হিদায়াহ ' গ্রন্থে উল্লেখ: 'সকল ক্ষেত্রে নারীর বিচার কাজ বৈধ। একমাত্র দন্ডবিধি তথা হুদুদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে ফয়সালা ব্যতীত। আর এ ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষীর বিষয়টি বিবেচনায়'।[৮৩]

ইবন রুশদ বলেন, "ইমাম আবু হানিফা বলেন, সম্পদের বিষয়ে বিচার কাজে নারী বিচারক হওয়া জায়েয"।[৮৪]

খ. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে: ইবন হাযম খিলাফতের বিষয়টি ব্যতীত প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের শাসনকে বৈধ বলেছেন। তিনি বলেন: নারীদেরকে প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া বৈধ। এটাই আবু হানিফার মত। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. শিফা নামে এক নারীকে তার স্বজাতির বাজার তদারকির দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছিলেন"।[৮৫]

তিনি এ বিষয়ে আল কুরআন থেকে দলিলও পেশ করেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন হকদারের নিকট আমানতসমূহ পৌঁছে দিতে। আর যখন তোমরা ফয়সালা দিবে তখন ন্যায়ের সাথে ফয়সালা দিবে"।[৮৬]

এখানে আমানত মানে কর্তৃত্বের আমানত। ইবন হাযম বলেন: এ আয়াতের নির্দেশনা নারী পুরুষ সকলকে সার্বিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি না কোনো স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে তা থেকে পৃথক করা হয়। তখন দীনের সার্বিক নির্দেশ থেকে একে প্রথক করা যাবে।[৮৭]

গ. ওয়াক্ফ স্টেটে: হানাফি মাযহাবের দুররুল মুখতারে এসেছে, নারীর কর্তৃত্বকে বিচারিক কাজের বাইরে আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়, "নারী ওয়াকফ স্টেটে নাযীর বা তদারককারী হওয়ার যোগ্য, সে ইয়াতিমদের জন্য ওসিয়্যতকারীনী হতে পারে, যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে"।[৮৮]

হযরত উমর রা. স্বীয় কন্যা হাফসা রা.-কে খায়বারের এক ওয়াক্ফ স্টেটের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।[৮৯]

ঘ. পার্লামেন্টে: ড. মস্তফা সাবাঈ নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিরোধিতা করলেও তারা পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন।[৯০]

ঙ. মন্ত্রণালয়ে: মহানবি সা. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ওযারাত তথা মন্ত্রণালয় ছিল না। মন্ত্রী নিয়োগ ব্যবস্থা ছিল না। মাওয়ার্দী উপরোক্ত আবু বাকারাহ রা. বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে নারীকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করাকেও অবৈধ বলেছেন। তার মতে মন্ত্রীর নিকট থেকে মতামত চাওয়া হয়, তার মাঝে দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন। এগুলো নারীদের মাঝে দুর্বল। বিভিন্ন বিষয় সরাসরি প্রত্যক্ষণ প্রয়োজন। যা নারীর জন্য নিষিদ্ধ'।[৯১]

ড. ইউসুফ আল কারযাভী ও যায়নাব গায্যালিসহ অনেকে নারীরা মন্ত্রী হওয়ার বৈধতার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।[৯২] তারা বলেন, আবেগ থাকলেই মতামত ও পরামর্শ দিতে দুর্বল হবে সেটা ঠিক নয়। মহানবি সা.-এর যুগেও নারীরা পরামর্শ দিয়েছেন। আর তা যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। যেমন: হুদায়বিয়ার ঘটনায় উম্মে সালামাহ রা.-এর পরামর্শ।

চ. সালাতের ইমামতিতে: পূর্বেই বলা হয়, অধিকাংশ আলিমের মতে ফরয বা নফল সালাতে নারীদের ইমামতি অবৈধ। তারা দলিল হিসেবে রসুল সা.-এর হাদিস উল্লেখ করেন। মহানবি সা. বলেন:"সাবধান! কোনো নারী কোনো পুরুষের ইমামতি করবে না"।[৯৩]

মাওয়ার্দী বলেন, কোনো পুরুষের জন্য জায়েয নয় কোনো নারীর ইমামতিতে সালাত আদায় করা। ইমাম শাফেঈর মতে তা করলে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। এটাই সঠিক মত। এ বিষয়ে সকল ফকীহগণ একমত পোষণ করেন। একমাত্র আবু ছাওর ব্যতীত। কেননা যে সালাতে পুরুষের ইমাম হতে পারে সে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অন্য পুরুষের মত নেতা হতে পারে"।[৯৪]

অপরদিকে, ইবন জরীর তাবারী, শাফেঈ মাযহাবের ইমাম মুযানী ও ইমাম আবু ছাওর রহ.-এর মতে সালাতে মহিলাদের ইমামতি বৈধ।[৯৫] এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদ রহ. নফল সালাতে নারী পুরুষের সালাতে নারীদের ইমামতি বৈধ বলেছেন। তাঁর অনুসারীদের কেউ কেউ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।[৯৬] এ মত অনুসারীদের দলিল: পূর্বে উল্লেখিত উম্মে ওয়ারাকাহ রা.-এর ইমামতি, [৯৭] যেখানে এজন পুরুষ আযান দিত।[৯৮] রসুল সা.-এর যুগেও আয়েশা রা. ও উম্মে সালামাহ রা. মহিলাদের নিয়ে ঘরে জামাতে সালাতে ইমামতি করেছেন। তবে সামনে না গিয়ে কাতারের ভিতরে থেকেছেন। মহানবি সা. নিজেও তা দেখেছেন ও অনুমোদন দিয়েছেন।[৯৯] এতে বুঝা যাচ্ছে, নারীরা তাদের নিজেদের সালাতে ইমামতি বৈধ। এর পক্ষে অনেক আলিম মত দিয়েছেন। তবে মালিকি মাযহাবের কেউ কেউ আপত্তি করেছেন।[১০০]

ষষ্ঠ অভিমত: রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব ব্যতীত অন্যান্য সবধরনের নারী নেতৃত্ব বৈধ

গোটা জাতির উপর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব তথা খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব ব্যতীত অন্যান্য সবধরনের নারী নেতৃত্ব বৈধ। যেমন: সংসদ সদস্য হওয়া, মন্ত্রী হওয়া ইত্যাদি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে তথা রাষ্ট্রপ্রধানের পদে

নারীকে নেতৃত্ব প্রদান করা নিষিদ্ধ। ড. ইউসুফ আল কারাযাভীসহ কিছু আলেম এ মত পোষণ করেন। তিনি বলেন: "পরিবারের গণ্ডির বাইরে কিছু পুরুষের উপর কিছু নারীর কর্তৃত্ব চালানো বিষয়ে শরিয়াতে এমন কোনো দলিল নেই যা প্রমাণ করে যে সেটা অবৈধ। বরং যা নিষিদ্ধ সেটা হলো সকল পুরুষের উপর কোনো নারীর সামগ্রিক কর্তৃত্ব"।[১০১]

এর সমর্থনে দলিল হিসেবে বলেন: সাধারণ অবস্থা থেকে এ নিষেধটি খাস বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে আবু বাকারাহ রা. বর্ণিত হাদিসটি। যাতে রসুল সা. বলেন: "যে জাতি তাদের উপর কর্তৃত্ব নারীদেরকে প্রদান করে, সে জাতি কখনো কল্যাণ পাবে না, সফল ও সার্থক হবে না"।[১০২]

এখানে أَمْرَ هُمْ তথা তাদের কর্তৃত্ব বলে তাদের সবোর্চ্চ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বুঝানো হয়েছে। এটা বুঝা গেল হাদিসটি যে প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছিল, তার আলোকে। কারণ সেখানে পারস্য সাম্রাজ্যে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়। অতএব, সাধারণভাবে নারী নেতৃত্ব বৈধ নয়। তবে এ হাদিসে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বকে খাস বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যা নারীর জন্য নিষিদ্ধ।[১০৩]

এভাবে যারা নারী নেতৃত্ব অবৈধ বলেন, তাদের দলিলের পর্যালোচনায় ড. কারযাভী আরো বলেন, নেতৃত্ব দিতে হলে, নির্বাচনে ভোট দিতে গেলে নারীদেরকে ঘর থেকে বের হতে হয়। আলিমগণের মতে প্রয়োজন ছাড়া নারীর ঘর থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চেয়ে সামাজিক প্রয়োজন আরো গুরুত্বপূর্ণ। আজকে সেকুলার নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে ভোট দিয়ে সেকুলারদের ক্ষমতায় বসাচ্ছে। ইসলামের স্বার্থে শরিআহ পালনকারী নারীগণ কি ভোট দেয়া তথা সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বের হওয়া কি প্রয়োজন নয়? আল কুরআনে ঘরে অবস্থান করার বিধানটি নবি সা.-এর স্ত্রীগণের জন্য কার্যকর ছিল। অনেকের মতে এটি সাধারণ মুসলিম নারীদের জন্যও প্রযোজ্য। কিন্তু সেটা মেনেও নিয়ে বলা যায়, একই আয়াতের অবশিষ্ট অংশ দেখা দরকার। সেখানে বের হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়, জাহেলী সমাজের মতো তাবাররুজ না করা তথা বেপর্দা ও অশ্লীলভাবে বের না হওয়া। অশ্লীলতা প্রদর্শন না করে বের হতে শরিআহর দৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই। আর বাস্তবতা হলো আজকে নারী শিক্ষা দীক্ষা, চাকুরির জন্য স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অফিসের উদ্দেশ্যে হরহামেশা ঘর থেকে বের হচ্ছে।[১০৪]

নারীরা সংসদ সদস্য হওয়ার বিরোধিতাকারীগণ যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেন, ড. কারযাভী সেগুলোরও সমালোচনা করে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, তারা এর বিরোধিতায় বলেন, পার্লামেন্ট তথা মজলিশে শুরার কাজ দু'ধরনের: ক. রাষ্ট্রপ্রধানের হিসেব নিকাশ নেয়া ও তাকে বিভিন্ন কাজে জবাবদিহি করা। দুই. সুচিন্তিত মত দিয়ে আইন প্রণয়ন করা। প্রথম কাজটি মূলত রাষ্ট্রপ্রধানের উপর কর্তৃত্ব করার নামান্তর। সে একজন পুরুষ হলে পুরুষের উপর কর্তৃত্ব বুঝায়। আল কুরআনে নারীদেরকে পুরুষের উপর কর্তৃত্ব দেয়নি (পূর্বে উল্লেখ করা হয়)। দ্বিতীয়ত: শরিআহর বিষয়ে জ্ঞান গবেষণা তথা ইজতিহাদে পুরুষরাই অগ্রগামী।

প্রথম পর্যায়ের বক্তব্যের পর্যালোচনায় তিনি যুক্তি দেন, পার্লামেন্টে পুরুষদের সংখ্যাই বেশি। তাই তাদেরই প্রাধান্য থাকে। তাছাড়া, শাসককে নাসীহত করা, পরামর্শ দেয়া, ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়ে দেয়াই ইসলামি

রাজনীতির মূল কথা। যা আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের অংশ। আল কুরআনে একাজে অংশগ্রহণের জন্য নারীদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে (পূর্বে বিবৃত)। মহানবি সা.ও মুসলমানদের সামষ্টিক বিষয়ে নারীর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। যেমন: হুদায়বিয়াহর সন্ধির প্রাক্কালে উম্মে সালামাহ রা.-এর পরামর্শে তিনি পদক্ষেপ নেন। মসজিদে নববীতে খলিফা উমর রা. এক ভাষণে নারীর সর্বোচ্চ মহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে চাইলে, সেই উম্মে সালামাহ রা.-এর বিরোধিতা করে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এসব প্রমাণ করে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ দেয়া ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বক্তব্যের পর্যালোচনায় তিনি যুক্তি দেন যে, নারী শিক্ষায় সুযোগ সুবিধা কম থাকার কারণেই তারা পিছিয়ে। কিন্তু তাই বলে জ্ঞান-গবেষণায় তাদের অবদান কম নয়। হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট অনেক বড় বড় বিদ্বান সাহাবিও ফাতাওয়া চাইতেন। কুরআন-সুন্নাহের ভিত্তিতে ইজতিহাদের দ্বার নারী পুরুষ উভয়ের জন্য উন্মুক্ত। কেউই এ কথা বলে না যে, ইজতিহাদ করার যোগ্যতার শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো: পুরুষ হওয়া। সুতরাং এ কাজে নারীদের অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই। এছাড়া, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়ে কোনো কোনো নারী অনেক পুরুষের চেয়েও অগ্রগামী হতে পারে। যেমন আল কুরআনে বর্ণিত সাবা রাণী এবং মহানবি সা.-এর সাহাবিগণের মধ্যে আয়েশা রা.।[১০৫]

একইভাবে নারী মন্ত্রীসভার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্পর্কে বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, দায়িত্ব সামষ্টিক, কর্তৃত্ব সকলের অংশীদারিত্বমূলক। যা একদল মানুষ কার্যকর করে, বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার দ্বারা। আর নারী তার অংশ মাত্র। সে একচ্ছত্র শাসক হতে পারে না। তার ক্ষমতা নিরংকুশ বা একচ্ছত্র নয়। যেকোনো সময় তার ক্ষমতা চলে যেতে পারে। সার্বিক পর্যালোচনা ও চিন্তাভাবনায় দেখা যায়, কোনো জাতি উপর নারীর শাসন নয়, বরং শাসন হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা গোষ্ঠীর ও ব্যবস্থাদির। যদিও কোনো নারী সর্বোচ্চে থাকুক না কেন। সেখানে সে নারী শাসক নয়। প্রধানমন্ত্রী শুধু এককভাবে শাসক নয়, বরং সামষ্টিকভাবে গোটা মন্ত্রী সভা হলো শাসক।[১০৬]

অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত ও উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, যারা নারী নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছেন, তাদের যুক্তির মূল কেন্দ্র বিন্দু নারীর যোগ্যতা, দায়িত্ব ও হিজাব ব্যবস্থা ঠিক রাখাকে কেন্দ্র করে। বাকি দলিলসমূহ সার্বিকভাবে প্রযোজ্য নয়, অংশ বিশেষের সাথে প্রযোজ্য। আর তা হলো সর্বোচ্চ পদ তথা খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। খিলাফত বা ইমামতকে সামনে রেখে তারা সামগ্রিক নেতৃত্বের উপর হুকুম সম্প্রসারিত করেছেন। পক্ষান্তরে যারা নারী নেতৃত্বের সমর্থক তারা বলছেন, কুরআন সুন্নাহে এ বিষয়ে কোনো নিষেধ নেই। তাছাড়া, কোনো কোনো নারীর নেতৃত্বের যোগ্যতা থাকতে পারে। যোগ্যতা থাকলে নারী যেকোনো ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারে। অন্যরা বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় বা বিশেষ ক্ষেত্রে বা প্রেক্ষাপটে নারী নেতৃত্ব বৈধ বলেছেন। তন্মধ্যে যারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বৈধ বলেছেন, তারা ইমামত কুবরা তথা রাষ্ট্রপ্রধান পদে নারী নেতৃত্বকে অবৈধ ধরেই সেসব মত দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে উল্লেখ করেন, নারীদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান তথা খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেয়া জায়েয না হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে উম্মাহ ঐক্যমত্য পোষণ

করেছেন।[১০৭] একইভাবে ড. কারযাভী এ সবোর্চ্চ পদটি ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে সম্প্রসারিত করেছেন। এদিক দিয়ে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর মতটি অধিক ভারসাম্যপূর্ণ। তাঁর বিজ্ঞজনোচিত মতে নারীর সর্বোচ্চ ক্ষমতায় বসানো সম্পর্কে হাদিসের ভাষ্য, নারীর সৃষ্টিগত দিক, যোগ্যতা বিবেচনা ও ইসলামি মূল্যবোধ বিবেচনা করা হয়েছে। তাই তাঁর মতটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার অধিক কাছাকাছি।

বস্তুত নারী নেতৃত্ব সার্বিকভাবে অবৈধ হওয়ার পিছনে স্পষ্ট শরঈ দলিল পাওয়া না গেলেও যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষ থাকলে সেখানে নেতৃত্বে নারীর প্রয়োজন নেই। কারণ নারীদের প্রজন্ম গড়ার ক্ষেত্রে একটি পৃথক দায়িত্ব রয়েছে। যেখানে পুরুষরা অক্ষম। তাই জন নেতৃত্বে ঘরের বাইরের কাজে পুরুষগণই অগ্রগণ্য। অন্যদিকে, হায়েযের কারণে পুরো মাস নারীর উপর সালাত ফরয নয়। তাই সালাতের ইমামতিতে পুরুষরাই অগ্রগণ্য। আর একই কথা রাষ্ট্রপ্রধানের পদটিতে। সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দেশ রক্ষার জন্য সর্বকালীন দায়িত্ব পালন প্রয়োজন। হায়েয অবস্থায় নারীদের মন মেজাজও সঠিক থাকে না। তাই সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা তাদের জন্য কঠিন। এজন্য একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগ্যতার দশটি মাপকাঠি থাকলে তন্মধ্যে ৮টি কোনো নারীর মাঝে পাওয়া গেলে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো পুরুষের না থাকলে, একমাত্র নারী হওয়ার কারণে কোনো যোগ্য নারীকে বঞ্চিত করা যায় না। তারাও সে সকল নেতৃত্ব দিতে পারে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান পদেও উম্মাহর কল্যাণার্থে উলামা পরিষদ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাই যৌথ ও অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব রয়েছে। সেখানে নারী নেতৃত্বে আসতে বাধা থাকতে পারে না।

নেতৃত্ব করার ক্ষেত্রটি যদি এমন হয়, যেখানে পুরুষের সাথে ভীড় জমাতে হয় না, স্বাভাবিক পর্দা রক্ষায় ব্যাঘাত ঘটবে না, একাকী কোনো এক পুরুষের সাথে একত্রে অবস্থান করতে হয় না এবং শূরা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেখানে নারী নেতৃত্ব বৈধ হওয়ার পথে ইসলামি মূল্যবোধ কেন্দ্রীক কোনো বাধা নেই।

এছাড়া, যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, একজন নারীই অধিক প্রভাবশালী এবং জ্ঞান ও দক্ষতায় উপস্থিত পুরুষদের চেয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্না। সে প্রেক্ষাপটে ঐ নারী ক্ষমতায় না বসলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, সেখানে নেতৃত্বে সে ধরনের নারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন: যদি এমন অবস্থা হয় যে, কোনো খাবার নেই একমাত্র মৃত গরু ও মৃত শুকরের গোশত ছাড়া। অন্যথায় ক্ষুধায় মৃত্যু অনিবার্য। এ অবস্থায় শুকর বেচে নিলে দুটি হারাম একত্রিত হলো। একে তো মৃত, তারপর শুকর। অপরদিকে, গরু শুধু মৃত হওয়ার জন্য হারাম হলো। এ অবস্থায় গরুর গোশত নির্বাচনই শ্রেয়। সৈয়দ আবুল আলাসহ পাকিস্তানের উলামায়ে কিরাম স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এ দৃষ্টিতেই ফাতিমা জিন্নাহর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার জন্য জনগণের নিকট ভোট চেয়েছিলেন।

চূড়ান্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে জনস্বার্থে নারীরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও অবস্থায় নেতৃত্ব বৈধ। যেমন: উপস্থিত পুরুষের চেয়ে কোনো নারী অন্যান্য যোগ্যতা বেশি থাকা। সে অধিক প্রভাবশালী হওয়ায় জনগণ তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে স্বস্তি মনে করা। মন্দের ভাল প্রতীয়মানতায়, ইত্যাদি। আবার

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও অবস্থায় নেতৃত্ব দেয়া বৈধ নয়। যেমন সর্বোচ্চ একক কর্তৃত্বে, যে নেতৃত্ব প্রয়োগে অবাধ মেলা মেশা করতে বাধ্য হতে হয়। নারী পুরুষ একত্রে সালাতের ইমামতিতে, গর্ভধারণের শেষাবস্থায় ও সন্তান প্রসবকালীন অবস্থায় ইত্যাদি। এ জন্য তাদের নেতৃত্বের পরিধি সীমিত ও শর্তসাপেক্ষ।

উল্লেখ্য, নারী হোক আর পুরুষ হোক কারো জন্য ইসলাম স্বৈরতান্ত্রিক বা একচ্ছত্র নেতৃত্বের অনুমোদন দেয় না বরং শরিআহর অধীনে পরামর্শভিত্তিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃত্বের অনুমোদন দেয়। এ ধরনের যৌথ ও সামষ্টিক নেতৃত্বে নারীকে বসানো অবৈধ নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত কয়েকটি কারণে গ্রহণ করা যায়।

প্রথমত: সম্মানিত ফকীহগণের প্রতি সম্মান রেখেই বলা যায়, যেখানে হারাম হওয়ার মত স্পষ্ট সরাসরি কোনো নির্দেশনা কুরআন সুন্নাহে নেই, সেখানে হারাম ঘোষণা দিতে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কুরআন হাদিস থেকে যে সব দলিল উল্লেখ করা হয়, সেগুলো একাধিক সম্ভাবনা (احتمال) সমৃদ্ধ। এধরনের অস্পষ্টতা নিয়ে হারাম প্রমাণিত হয় না।[১০৮]

দ্বিতীয়ত: আল কুরআনের আয়াতসমূহ নারী নেতৃত্বের অবৈধতা ঘোষণা করে না, বরং আল কুরআনে সাবা রাণীর কথা উল্লেখ আছে। যিনি শুরা ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন।

তৃতীয়ত: আর আবু বকর রা.-এর যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়, সেটি নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু সমস্যা হলো হাদিসটি সহিহ বুখারিতে বর্ণিত। এ গ্রন্থের হাদিস নিয়ে বক্তব্য প্রদান করা সহজ নয়। যে জন্য অধিকাংশ আলিম উক্ত হাদিসটি গ্রহণ করেন। কিন্তু হাদিসটি সহিহ বলে মেনে নিলেও এর ভাবার্থ ও প্রেক্ষাপট নিয়েও কথা রয়েছে। সেটি হতে পারে পরিস্থিতি বর্ণনামূলক বা সম্রাট তথা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বিষয়ে। অন্যথায় নারীরাও নেতৃত্বে কখনো কখনো সফল হয়েছেন। আল কুরআনেও নারী নেতৃত্বের সফলতার নমুনা আছে। সে বাস্তবতায় হাদিসটির ভাষ্য আল কুরআন ও বাস্তবতার বিপরীতমুখী হয়ে যায়। ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়ে এ ধরনের একটি হাদিস ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

মহানবি সা.-এর যুগে তিনি নারীদের পক্ষে তথা নারী প্রতিনিধির সাথে কথা বলেছেন। বর্ণিত আছে: একদা মুয়ায ইবনে জাবাল রা.-এর ফুফাত বোন আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা. রসুল সা.-এর বৈঠকে এসে আরয করলেন:

'আমি আমার পশ্চাতে অবস্থিত মুসলিম নারীসমাজের প্রতিনিধি, তারা সকলেই আমার কথায় একমত এবং আমি তাদের মতটি আপনার কাছে প্রকাশ করছি। কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে রসুল হিসাবে পাঠিয়েছেন পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি। আমরা আপনার প্রতি ইমান এনেছি এবং আপনাকে অনুসরণ করে চলছি। কিন্তু আমরা-নারীরা-পর্দানশীল ও ঘরের অভ্যন্তরে বসে থাকি, পুরুষদের লালসার কেন্দ্রস্থল আমরা এবং তাদের সন্তানদের বোঝা বহন করি মাত্র। জুমা ও জানাযার নামায এবং জিহাদে শরীক হওয়ার একচ্ছত্র অধিকার পেয়ে পুরুষরা আমাদের ছাড়িয়ে গেছে অথবা তারা জিহাদের জন্যে ঘরের বাইরে চলে যায়, তখন আমরাই তাদের ঘড়-বাড়ি দেখাশোনা করি এবং তাদের সন্তানদের লাল-পালনের দায়িত্ব বহন করি।

এমতাবস্থায় সওয়াব পাওয়ার দিক দিয়েও কি আমরা তাদের সঙ্গে ভাগীদার হতে পারব হে রসুল? ... রসুল সা. একথা শুনে বললেন: হে আসমা, তুমি আমায় সাহায্য ও সহযোগিতা কর। যেসব নারী তোমাকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছে তাদেরকে আমার তরফ হতে একথা পৌঁছিয়ে দাও যে, ভালভাবে ঘর সংসারের কাজ করা, স্বামীদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করা এবং তাদের সাথে মিলমিশ রক্ষা করণার্থে তাদের কথা মেনে চলা- পুরুষদের যেসব কাজের উল্লেখ তুমি করেছ তার সমান মর্যাদাসম্পন্ন'।[১০৯]

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, মহানবি সা. নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃত্বের অনুমোদন দেন।

রসুল সা.-এর যুগে আসলাম গোত্রের রাফীদাহ[১১০] নামে এক মুসলিম মহিলা মদিনায় একটি হাসপাতাল ও সরাইখানার দায়িত্বে ছিলেন, আর রসুল সা. তার কাজে অনুমোদন দেন।[১১১] যুদ্ধ ময়দানে মুসলিম যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবার দায়িত্ব দেন নারীদেরকে। উমর রা. তাঁর খিলাফত আমলে শিফা[১১২] নামে এক মহিলাকে ইনসপেক্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। যেগুলোকে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বলা যায়। ৩৬ হিজরিতে অনুষ্ঠিত জামাল বা উষ্ট্র যুদ্ধে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. মুরুব্বী হিসেবে উপস্থিত থেকে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছিলেন।

তারপরও বৃহৎ আলিম সমাজ প্রধানত তিনটি দিক বিবেচনা করে নারী নেতৃত্বকে অবৈধ বলেছেন:

ক. সন্তান লালন-পালন তথা ভবিষৎ প্রজন্ম গড়ায় নারীর অবদান রাখার যোগ্যতা।

খ. সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করার আবশ্যকতা রয়েছে, সে ধরনের নেতৃত্বে নারী সৃষ্টিগত কারণেই অক্ষম। হায়েয নিফাসের জন্য। এ পর্যায়ে আসে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া। দেশের নিরাপত্তাসহ অনেক জরুরি বিষয়ে তার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন।

গ. হিজাবের বিধান তথা ইসলামি মূল্যবোধের কথা বিবেচনা করেছেন।

এ সব দিক বিবেচনা করে একটি সিদ্ধান্ত আসা যায়। তাহলো: শরিআহ কর্তৃক আরোপিত সৃষ্টিগত, সময়, পরিবেশ ভিত্তিক নারীর দায়িত্ব পালন ও নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও অধিকারের মাঝে সমন্বয় করে কিছু শর্তারোপ করা। সুতরাং শর্ত সাপেক্ষে নারী নেতৃত্বকে বৈধ বলা যায়। শর্তগুলো নিম্নরূপ প্রস্তাব করা যায়:

১. নেতৃত্বে নারীর সমকক্ষ গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী কোনো পুরুষ না থাকা।[১১৩]

২. ইসলামি শরিআহ মোতাবেক নারী নেত্রীর পর্দা মেনে চলা।

৩. এককভাবে কোথাও বের না হওয়া।

৪. নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫. সর্বোচ্চ একক কর্তৃত্বে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত না হওয়া।

৬. সামগ্রিক কর্তৃত্ব প্রয়োগমূলক না হওয়া।

৭. অন্যের সাথে অংশগ্রহণমূলক ও শুরা তথা পরামর্শ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা।

৮. তার বয়স পঞ্চাশ উর্ধ্ব হওয়া। যে সময়ে সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব তার উপর না থাকা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ইসলাম নারীদের প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা করেনি। বরং মানবসভ্যতা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য কাউকে কাউকে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালনে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু প্রাধান্য দেয়ার অর্থ এই নয় যে, অপরকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দেয়া। যে কেউ যোগ্যতাসম্পন্ন হলে এবং মানব সভ্যতাগত ব্যবস্থাদি সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত থাকলে সাধারণভাবেই সকলকে সমসুযোগ দেয়া যেতে পারে। এমনি একটি দৃষ্টিভঙ্গি নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে। সুতরাং শর্তসাপেক্ষে নারী নেতৃত্ব বৈধ।

গ্রন্থপঞ্জি

---

১ যেমন মুফতী আমিনী স্পষ্টতই প্রয়োজনে নারী নেতৃত্ব বৈধ বলেছেন (দৈনিক প্রথম আলো, ৩১. ৮. ২০১৩)।

২ http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=6805&CATE=3600.

৩ *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত অভিধান*, সম্পা. আহমদ শরীফ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ৪র্থ সং, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩২৪।

৪ A S Hornby, *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press,1987), p. 480.

৫ Barnerd Kich & Tomas Kaich, *How to become an influential Manager*, (London: Academy of Management executive, November, 1990), p. 38-51.

৬ C. I. Barnard, *Organization and Management*. p. 83. (Quoted in Avasti and Maheswari, *Public Administration*. p. 174.)

৭ N. R. F. Mayar, *psychology in industry*, (Hugton Miffin & Co. 3rd ed.) p. 38-51.

৮ শাওকানী, নায়লুল আওতার (মাকতাবাহ শামিলা, ৪র্থ সং), ৮খ, পৃ. ২৭৪; আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতাওয়া কমিটি, কমিটি প্রধান: শায়খ মুহাম্মদ আবদুল ফাত্তাহ আল ইনানী।

৯ সুরা আন নিসা, ৪: ৩৪।

১০ অধ্যাপক মুহা. রুহুল আমীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ সং, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫-৬।

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১২ সুরা বাকারা, ২: ২২৮।

১৩ সুরা আল আহযাব, ৩৩: ৩৩।

১৪ অধ্যাপক মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

১৬ সুরা হাজ, ২২: ৪১।

১৭ অধ্যাপক রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

১৮ সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল মাগাযী, বাবু কিতাবিন নবি ইলা কিসরা, হাদিস নং ৪৪২৫ ও কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ৭০৯৯। এটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে আহমদে। উস্ট্র যুদ্ধে আয়েশা (রা.) বিভিন্ন আদেশ নিষেধ তথা নির্দেশ প্রদান করেছেন। (ইবন কাসির, প্রাগুক্ত)।

[১৯] শাওকানী, প্রাগুক্ত, ৯খ. পৃ. ১৩৭।

[২০] শাওকানী, *আল সাইলুল জাররার* (বৈরুতঃ দারু আল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ খ্রি.; রিয়াদঃ মাকতাবা শামিলা, ৪র্থ সং), ৪খ, পৃ. ২৭৩।

[২১] হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ (৫খ, পৃ. ৩৭৮) হায়ছামী বলেন, হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন অজ্ঞাত থাকায় এটি দুর্বল হাদিস।

[২২] মুসনাদ আহমদ (রিয়াদঃ মাকতাবাহ শামিলা, ৪র্থ সং), ৫খ, পৃ. ৪৫।

[২৩] মুসনাদ আহমদ, মুআসসাসাতু কুরতুবা, কায়রো সংস্করণ, (রিয়াদঃ মাকতাবাহ আশ শামিলা, ৪র্থ সং), ৫খ, পৃ. ৪৫।

[২৪] মুস্তাদরাক হাকিম, ৪খ, পৃ. ৩২৩, হাদিস নং ৭৭৮৯।

[২৫] শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, ৯খ,. পৃ. ১৩৭।

[২৬] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদিস নং ১৮২৫-১৮২৬; মুসনাদ আহমদ, ৫খ. পৃ. ১৭৩।

[২৭] সহিহ ইবন খুযায়মাহ, ৩খ, পৃ. ৯৯, হাদিস নং ১৭০০; তাবারানী, আল মুজামুল কাবীর, ৯খ, পৃ. ২৯৫, হাদিস নং ৯৪৮৪, হায়ছামী বলেনঃ এ হাদিসের বর্ণনা কারীগণ সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারীদের মত বিশ্বস্ত। (মাজমাউয যাওয়াইদ, ২খ, পৃ. ৩৫).

[২৮] আবুল হাসান আল মাওয়ারদী, আল হাভী আল কাবীর (রিয়াদঃ মাকতাবাহ শামিলা, ৪র্থ সং), ২খ, পৃ. ৭৩৮।

[২৯] অধ্যাপক রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

[৩০] সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল হায়য, পরিচ্ছেদঃ হায়য অবস্থায় সাওম ছেড়ে দেয়া, হাদিস নং ২৯৮।

[৩১] অধ্যাপক রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[৩২] কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১৩খ, পৃ. ১৮৪।

[৩৩] সুরা আল আহযাব, ৩৩ঃ ৩০।

[৩৪] মওলানা আকরম খাঁ, 'ইসলামের রাজ্যশাসন বিধান', দ্র. *মওলানা আকরম খাঁ*', সংকলন ও সম্পা. আবু জাফর (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৪৯৭, ৫০২।

[৩৫] ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী শারহ সহিহ আল বুখারি* (কায়রোঃ দার আল রাইয়্যান লিত তুরাছ, ১৪০৭ হি.), ১৩খ, পৃ. ৬০।

[৩৬] মওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

[৩৭] শায়খ মুহাম্মদ আল গায্যালি, *আল সুন্নাহ আর নাবুবিয়্যাহ বাইনা আহলিল ফিকহ ওয়া আহলিল হাদিস* (বৈরুতঃ দারুশ শুরুক,) পৃ. ৫৬।

[৩৮] শায়খ আব যাহরাহ, *উসূলুল ফিকহ* (কায়রোঃ দারু আল ফিকর আল আরাবী, ১৩৭৭ হি./১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ১৩০। ড. হাশিম কামালী বলেন, "The actual wording of a general ruling is therefore to be taken into consideration regardless of its cause. If the rulig is conveyed in general terms, it must be applied as such even if the cause behind it happens to be specific." (Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* , Cambridge: Islamic Texts Society, 1991, P. 112)

[৩৯] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *মিন ফিকহি আদ দাওলাহ ফি আল ইসলাম* (কায়রোঃ দারুশ শুরুক, ৩য় সং, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৭৫।

[৪০] প্রাগুক্ত।

[৪১] মুহাম্মদ আল গায্যালি, প্রাগুক্ত; ড. কারযাভী, প্রাগুক্ত।

[৪২] ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ১২৮।

[৪৩] সুনান আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং ৫৭৭, ৫৭৮।

[৪৪] *সহিহ ইবন খুযায়মাহ*, বাব ইমামাতুল মারআতি লিন নিসা, হাদিস নং ১৬৭৬, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামি, ১৩৯৫ হি.), ৩খ., পৃ. ৮৯।

[৪৫] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ১খ., পৃ. ২০৪; *সুনান দারাকুতনী*, কিতাবুস সালাত, ১খ., পৃ. ৪০৪; *মুসনাদ ইমাম যায়েদ ইবন আলী ইবন হুসাইন* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০১ হি.), পৃ. ১১১।

[৪৬] হীরাত বর্তমানে আফগানিস্তানের একটি শহর। যা দেশটির উত্তর-পশ্চিম অংশে ইরানের সাথে সংলগ্ন।

[৪৭] সহিহ বুখারি, কিতাবুল মানাকিব, বাব আলামাতিন নাবুওয়াহ ফিল ইসলাম, হাদিস নং ৩৫৯৫। এ হাদিসটি মুসনাদ আহমদ, সুনান দারাকুতনী সহ অনেক হাদিসগ্রন্থে এসেছে। সুনান দারাকুতনী, কিতাবুল হজ্ব, ২খ, পৃ. ২২৮, হাদিস নং ২৪৯০।

[৪৮] ইবন কাসিম, *আল মুসতাদরাক 'আলা ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ* (মাকতাবা শামিলা, ৩য় সং,) ৩খ., পৃ. ১৪৭; ইমাম নাওয়াভী, আল মাজমু, (মাকতাবা শামিলা, ৩য়সং), ৮খ, পৃ. ৩৪২; আয়নী, 'উমদাতুল কারী শারহ সহীহিল বুখারি (মাকতাবা শামিলা, ৩য়সং), ১৬খ., পৃ. ১৪৮।

[৪৯] মুসনাদ আহমদ, ২খ., পৃ. ৪৪৫, ৩খ., ৬২, ৩৪৭; সহিহ বুখারি, কিতাব জাযাইস সায়দি, বাবু হাজ্জি আল নিসা, হাদিস নং ১৮৬৪; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, হাদিস নং ৩৩২৬, ৩৩২৮, ৩৩৩০, ৩৩৩৪।

[৫০] ইবন নুজাইম, *আল বাহরু আর রাইক শারহ কানযুদ দাকাইক* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ) ৫খ, পৃ. ৭।

[৫১] সাজারাতুর দুর্‌রা বাদশা সালিহের পুত্র খলীলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। (উমর রিদা কাহ্‌হালাহ, *আলামুন নিসা*, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৩৯৭ হি., ২খ., পৃ. ২৮৬-২৮৭)।

[৫২] ইবন রশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ* (মাকতাবা শামিলা, ৪র্থ সং,), ২খ., পৃ. ৪৬০।

[৫৩] শায়খ মুহাম্মদ আল গায্‌যালি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০; আবদুল হামীদ আল মুতাওয়াল্লী, *মাবাদিউ নিযামিল হুকমি ফিল ইসলাম* (ইসকান্দারিয়াহ, মিসর: মানশাআতুল মাআরিফ, ১৯৭৮ খ্রি.) পৃ. ৪৪৩।

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

[৫৫] মওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২-৫০৩।

[৫৬] প্রফেসর রাফী উল্লাহ শিহাব, *মানসাবে হুকুমাত আওর মুসলমান আওরাত* (লাহোর, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৬২; জাভীদ জামাল দাসকাভী, *ইসলাম আওর আওরাত কি হুকুমাত* (লাহোর: মাতবাআহ জাঙ্গ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৬।

[৫৭] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৯৫।

[৫৮] প্রফেসর রাফী উল্লাহ শিহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬; দাসকাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[৫৯] সুরা আত তওবা, ৯: ৭১।

[৬০] প্রফেসর শিহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬।

[৬১] সুরা নামল, ২৭: ২৩।

[৬২] প্রাগুক্ত: ৩২-৩৫।

[৬৩] মুহাম্মদ আল গায্‌যালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

[৬৪] মাহমূদ আলূসী, *রূহুল মাআনী* (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি), ১৯খ., পৃ. ১৮৯।

[৬৫] সুরা আত তওবা, ৯: ৬৭।

[৬৬] মুহাম্মদ আল গায্‌যালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

[৬৭] ইবন কাসির, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি), ৭খ., পৃ. ২৪০।

[৬৮] দাসকাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[৬৯] প্রফেসর রাফীউল্লাহ শিহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১৩০।

[৭০] ইমাম আল জাস্‌সাস, *আল ফুসূল ফি আল উসূল* (কুয়েত: ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউন আল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), ৪খ., পৃ. ৮৬; ইবন নুজাইম, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৫৬-৫৭।

[৭১] মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানভী, ইমদাদুল ফাতাওয়া, (উর্দ্দু করাচী সংস্করণ), ৫খ., পৃ. ৯৯-১০১।

[৭২] রাফী উল্লাহ শিহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

[৭৩] খাত্তাবীর সুত্রে ইবন হাজার আসকালানী এ মতটি বর্ণনা করেন। দ্র. ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শারহ সাহীহিল বুখারি, ১২খ., পৃ. ২৪৭।

[৭৪] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল হাত্তাব, *মাওয়াহিবুল জালীল ফি শারহি মুখতাসিরি আশ শায়খ আল খালীল* (ত্রিপলী, লিবিয়া: মাকতাবাতুন নাজাহ, তাবি), ৬খ, পৃ. ৮৭; মাকতাবা শামিলা ৪র্থ সং ১৭খ, পৃ. ১৭।

[৭৫] আল হাত্তাব, প্রাগুক্ত; ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, ১২খ., পৃ. ২৪৭; আল শাওকানী, নায়লুল আওতার, ৯খ, পৃ. ১৩৭। কিন্তু ইবনুল আরাবী বলেন, এরূপ বর্ণনা সঠিক নয়। দ্র. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন* (কায়রো: মাকতাবাহ ঈসা আল হালাবী, ১৩৮৭ হি.), ৩খ, পৃ. ১৪৪৪; কুরতুবী, *আল জামি'উ লি আহকামিল কুরআন* (রিয়াদ: মাকতাবাহ শামিলা, ৪র্থ সং), ১৩খ, পৃ. ১৮৩।

[৭৬] ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি.), ২খ, পৃ. ২৭৭।

[৭৭] আল হাত্তাব, প্রাগুক্ত।

[৭৮] কুরতুবী, আল জামি লি আহকামিল কুরআন, ১৩খ., পৃ. ১৮৩।

[৭৯] ইবন হাযম বলেন: وَلَا يَجُوزُ الأَمْرُ لِغَيْرِ بَالِغٍ, وَلَا لِمَجْنُونٍ, وَلَا امْرَأَةٍ খিলাফতের দায়িত্ব কোনো নাবালগ, পাগল এবং নারীকে দেয়া জায়েয নয় (ইবন হাযম, আল মুহাল্লা (মাকতাবা শামিলা, ৪র্থ সং), ১খ, পৃ. ৪৫)। তার আগের আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এখানে الأَمْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য খিলাফত (প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৪৪)। এখানে أَمْر দ্বারা উদ্দেশ্য খিলাফত।

[৮০] ইবন হাযাম, প্রাগুক্ত, ৯খ., পৃ. ৩৯৩।

[৮১] প্রাগুক্ত, ৯খ., পৃ. ৪১৫।

[৮২] প্রাগুক্ত, ৯খ., পৃ. ৩৬৩।

[৮৩] বুরহান উদ্দীন আল মারগানানী, আল হিদায়াহ, কিতাবুল কাদা।

[৮৪] ইবন রুশদ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩৭৭।

[৮৫] ইবন হাযম, প্রাগুক্ত, ৯খ., পৃ. ৪২৯।

[৮৬] সুরা আন নিসা, ৪: ৫৮।

[৮৭] ইবন হাযম, প্রাগুক্ত, ৯খ., পৃ. ৪৩০।

[৮৮] আল হাসকাফী, আদ দুররুল মুখতার (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৮৬ হি.), ৫খ, পৃ. ৪৪০।

[৮৯] সুনান আবী দাউদ, কিতাবুল ওসায়া, হাদিস নং ২৮৭৯; বায়হাকী, আস সুনান, ৬খ, পৃ. ১৬০।

[৯০] ড. মস্তফা সাবাঈ, *আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানূন* (বৈরুত: আল মাকতাব আল ইসলামি, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১৫১-১৬১।

[৯১] মাওয়ার্দী, আল আহকাম আল সুলতানিয়া (মাকতাবা শামিলা, ৪র্থ সং), পৃ. ৪৪।

[৯২] ইবনুল হাশিমী, *আল মারআতুল মুসলিমাহ ওয়া হুমুমুদ দা'ঈআহ যায়নাব আল গাযযালি* (কায়রো: দারুল ইতিসাম,), পৃ. ২৪২।

[৯৩] সুনান আল বায়হাকী, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং ৫৩৩৫, বায়হাকী বলেন, হাদিসটি সনদগত দুর্বল। (আবু বকর আল বায়হাকী, *আস সুনান আল কুবরা*, হায়দারাবাদ: দারুল মাআরিফ আন নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি., ৩খ, পৃ. ৩৪৭)

[৯৪] মাওয়ার্দী, *আল হাভী আল কাবীর* (রিয়াদ: মাকতাবা শামিলা, ৪র্থ সং), ২খ. পৃ. ৭৩৮।

[৯৫] ইবন কুদামাহ, *আল মুগনী* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৩ হি.), ২খ., পৃ. ২৯৯।

[৯৬] প্রাগুক্ত।

[৯৭] সুনান আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং ৫৭৭, ৫৭৮।

[৯৮] *সহিহ ইবন খুযায়মাহ*, বাব ইমামাতুল মারআতি লিন নিসা, হাদিস নং ১৬৭৬, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামি, ১৩৯৫ হি.), ৩খ., পৃ. ৮৯।

[৯৯] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ১খ., পৃ. ২০৪; *সুনান দারাকুতনী*, কিতাবুস সালাত, ১খ., পৃ. ৪০৪; *মুসনাদ ইমাম যায়েদ ইবন আলী ইবন হুসাইন* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০১ হি.), পৃ. ১১১।

[১০০] আবুল কাসিম, *আল তাফরিউ* (বৈরুত: দারুল গারাব ইসলামি, ১৪০৮ হি.), ১খ., পৃ. ২২৩।

[১০১] ড. কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

[১০২] সহিহ আল-বুখারি, কিতাবুল মাগাযী, বাবু কিতাবিন নবি ইলা কিসরা, হাদিস নং ৪৪২৫ ও কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ৭০৯৯।

[১০৩] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত।

[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪,

[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৯।

[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

[১০৭] আবু আবদুল্লাহ আল বাগাভী, *শারহুস সুন্নাহ* (বৈরুত সংস্করণ, ১৪০০ হি.), ১০খ., পৃ. ৭৭; আবুল মাআলী আল জুওয়াইনী, *কিতাবুল ইরশাদ ইলা কাওয়াতিইল আদিল্লাহ* (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৩৬৯ হি.), পৃ. ৪২৭; আলী ইবন মুহাম্মদ আল আমিদী, *গায়াতুল মুরাম* (কায়রো, ১৩৯১ হি.), পৃ. ৩৮৩; কুরতুবী, আল জামি লি আহকামিল কুরআন, ১খ., পৃ. ২৭০; ড. মহিউদ্দীন আল আজালানী, '*আবকারিয়াতুল ইসলাম ফি উসূলিল হুকমি* (বৈরুত: দারুন নাফাইস, ১৪০৫ হি.), পৃ. ৭০।

[১০৮] শায়খ সোলায়মান আল জামাল, *হাশিয়াতুল জামাল আলাল মিনহাজ লি শায়খ যাকারিয়া আল আনসারী* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ৫০০; মুহাম্মদ আল শানকীথী, *শারহ যাদ আল মুসতানকি* (মাকতাবা শামিলা, ৪র্থ, সং), ৯খ., পৃ. ৩৩৪।

[১০৯] ইউসুফ ইবন আবদিল বার, *আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব*, (রিয়াদ: মাকতাবা শামিলা, ৩য় সং) ১খ., পৃ. ৫৭৬।

[১১০] দ্র. ইবন হিশাম, *আস সীরাতুন নাববিয়্যাহ* (বৈরুত: দারুল জায়ল, ১৪১১ হি.), ৪খ, পৃ. ১৯৮।

[১১১] প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১৯৯।

[১১২] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত।

[১১৩] সুরা বাকারা, ২: ২২৮।